এনসিটিবি অনুমোদিত ইসলামের ইতিহাস বইয়ে সাহাবা বিদ্বেষ!

✍️ ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল

তিনি লিখেন- উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে মানবিক বিভাগে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয়। মানবিক বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষার্থী 'ক' গুচ্ছে নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়ের একটি হিসেবে ইসলামের ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে এনসিটিবি অনুমোদিত কয়েকটি বই রয়েছে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি কয়েকটি বই সংগ্রহ করে পড়েছি এবং পড়ে মনে হয়েছে

হযরত মুআবিয়া রা. ও

হযরত আমর ইবন আস রা. সম্পর্কে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো তাঁদের জন্য অসম্মানজনক।

যেমন : কুচক্রী, ধূর্ত, কপট, শঠ, ষড়যন্ত্রকারী, মিথ্যা রটনাকারী, ক্ষমতালোভী ইত্যাদি।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির একজন কিশোর এ সকল শব্দে উনাদের মত জলিলুল কদর সাহাবীদের সম্পর্কে পড়বে এবং লিখবে, এটা সঠিক নয়।

মুসলিম খিলাফতের পাশ্চাত্য বয়ানভিত্তিক এ জাতীয় সমালোচনার পরিবর্তে সম্মানজনক শব্দ প্রয়োগে কীভাবে ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা যায়, তা নিয়ে বরেণ্য আলিম ও ইসলামিক স্কলারদের মতামত নেয়া যেতে পারে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন সংস্করণের আগে বিষয়গুলোর সংস্কার হওয়া দরকার। আশা করছি এনসিটিবি বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবে।

নমুনা হিসেবে আমার কাছে থাকা ৪টি বইয়ের কিছু চুম্বক অংশ নিম্নে তুলে ধরছি।

(১)

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মোঃ আবু তাহের পাটওয়ারী ও

ড. মোঃ আব্দুল মতিন,

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিমিটেড, সংশোধিত সংস্করণ: ২০২৪/২০২৫

(ক)

মুআবিয়া রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার স্থলে সুহাইল ইবন হানিফকে নিযুক্ত করা হলে কুচক্রী মুয়াবিয়া খলিফার নির্দেশ অমান্য করেন।” পৃ. ১৭৮

“কিন্তু চক্রান্তকারী ও উচ্চাভিলাষী সিরিয়ার শাসনকর্তা” পৃ. ১৮০

“ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া হযরত ওসমানের হত্যাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে উঠেন।” পৃ.১৮১

“মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, ধৃষ্টতা, উদ্ধত স্বভাব, কুচক্রী মনোভাব ও রাষ্ট্রদ্রোহিতায় হযরত আলী বিচলিত হয়ে পড়েন। পৃ. ১৮১

“হযরত আলী মুয়াবিয়ার শঠতা ও ধূর্ততা উপলব্ধি করে যুদ্ধ স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না।” পৃ. ১৮২

(খ)

মুআবিয়া ও আমর ইবন আস রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়ার যে খিলাফতের প্রতি দুর্বলতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার সাথে মিসর বিজয়ী আমর ইবন আল আসের গোপন চুক্তিতে। প্রথম দিকে শত্রুতা থাকলেও আমরের সাথে মুয়াবিয়া গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আমর যদি মুয়াবিয়ার সাথে যোগ দেন তবে মুয়াবিয়া হযরত আলীকে পরাজিত করতে পারলে তাকে পুনরায় মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হবে। এই দুই ধূর্ত ও চতুর ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে যোগাযোগ নিঃসন্দেহে হযরত আলীর শক্তিকে ক্ষীণ করে। পৃ. ১৮১

(গ)

আমর ইবন আস রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“আমরের ধূর্ততা ও শঠতার ফলে সহসা যুদ্ধ স্থগিত হয়।” পৃ. ১৮২

“সভার কাজ শুরু হবার পূর্বে ধূর্ত ও কপট আমর সরলমতি আবু মুসাকে বুঝালেন” পৃ. ১৮২

“আমরের শঠতা ও কপটতা” পৃ. ১৮৩

(২)

মোঃ মাহমুদুল হাছান,

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র (ঢাকা: লেকচার পাবলিকেশন্স লি. সম্পুর্ণ নতুন সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২৩)

(ক)

উসমান রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“হযরত উসমান রা.-এর দুর্বল প্রকৃতি তার দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ ছিল। …… তিনি অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধীকেও ক্ষমা করতেন।” পৃ. ১৯১

(খ)

সাহাবী রা.-গণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“মহানবি (স.)-এর বিশ্বস্ত সাহাবিদের অনেকেই এ সময় জীবিত ছিলেন না, যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-কে বিপদের দিনে সৎ পরামর্শ ও সাহায্যদানে এগিয়ে আসেননি। ইসলামের মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি ও জীবিত সাহাবিদের নিষ্ক্রিয়তা হযরত উসমান (রা)-এর শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করেছিল। পৃ. ১৯১

(গ)

মুআবিয়া রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“মুয়াবিয়া (রা.) এক পর্যায়ে নিজেকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা দেন এবং রক্তপাত নীতি গ্রহণ করেন। কূটকৌশলে বিজয়ী হয়ে ৬৬১ সালে মুয়াবিয়া খলিফা (শাসক) নির্বাচিত হন। পৃ. ১৯৩

“মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে তিনি এ হত্যাকাণ্ডের সাথে হযরত আলী (রা.) জড়িত ছিলেন বলে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করেন।” পৃ. ১৯৯

“হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার ধৃষ্টতা, অবাধ্যতা ও খিলাফত লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য .. “ পৃ. ১৯৯

“কিন্তু মুয়াবিয়ার ঔদ্ধত্যের কারণে কোনো পরিবর্তন হলো না।” পৃ. ১৯৯

“হযরত আলী (রা) মুয়াবিয়ার চতুরতা ও ধূর্তামি বুঝতে পারলেন” পৃ. ১৯৯

(ঘ)

আমর ইবন আস রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

”ধূর্ত ও কপট আমর সভার কাজ শুরু হওয়ার আগে আবু মুসা আল আয়শারীকে ডেকে দুজনে আলোচনা করলেন।” পৃ. ২০০

“এরপর নীলনকশার রূপকার আমর দাঁড়িয়ে জনসমাবেশে বললেন . “ পৃ. ২০০

(৩)

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও

ড. এ টি এম সামছুজ্জোহা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র (ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশনী, একাদশ সংস্করণ আগস্ট ২০২৪)

(ক)

উসমান রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

"খলিফার চারিত্রিক দুর্বলতা: বিভিন্ন গুণে বিভূষিত হলেও খলিফা ওসমান (রা-এর চরিত্রগত দুর্বলতাই ছিল তার হত্যার অন্যতম কারণ।" পৃ. ১৭১

(খ)

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ হিসেবে একটি পয়েন্ট লেখা হয়েছে 'আয়েশা (রা)-এর বিদ্বেষ' শিরোনামে। পৃ. ১৭৮

(গ)

মুআবিয়া রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

"মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু। খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার তাৎক্ষণিকভাবে করা আলির পক্ষে সম্ভব নয় - মুয়াবিয়া এটা বুঝতে পেরে বিচারকাজে খলিফার বিলম্বকে নিজের স্বার্থে

ব্যবহার করেন। তিন এ হত্যাকাণ্ডের সাথে হযরত আলি (রা) নিজেও জড়িত ছিলেন বলে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে শুরু করেন।” পৃ. ১৮১

“খলিফা তার প্রতিপক্ষ মুয়াবিয়ার কূটকৌশলের মর্মার্থ উপলব্ধি করে বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান।” পৃ. ১৮২

(ঘ)

আমর ইবন আস রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে-

“কিন্তু মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস ছিলেন একজন ধূর্ত কূটনীতিবিদ।” পৃ. ১৮২

.

(ঙ)

হাসান আলী চৌধুরী,

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র (ঢাকা: আইডিয়াল বুকস ঢাকা, দ্বাদশ সংস্করণ: ২০২৪)

উসমান রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“প্রায়ই কঠিন অপরাধীকেও ক্ষমা করতেন।” পৃ.১৭২

মুআবিয়া রা. সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

“কিন্তু ধূর্ত মুয়াবিয়া বাঘের মোকাবিলা করতে রাজি ছিল, কিন্তু ‘আল্লাহর বাঘের’ (শের-ই-খোদা) সাথে লড়াই করে অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজি হলেন না।” পৃ. ১৭৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে, কুরআনের আলোকনির্দেশনা অনুসারে যে মুবারক জামাত তৈরি করেছেন, তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদি.।

তাঁরাই আমাদের জন্যে ইসলামচর্চার অনুপম আদর্শ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন কারিমে, সূরা বাকারায় আমাদের নির্দেশ করেছেন, 'আমরা যেন সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের মতো ঈমান আনয়ন করি।' [সূরা বাকারা : ১৩]

কাজেই পরবর্তী উম্মাহ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা জীবনের পদে পদে তাঁদের ভালো বিষয়গুলো অনুসরণ করব। তাঁদের কারো জীবনে কখনো যদি মানবিক দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে থাকে তাহলে সে বিষয়ে আমরা শতভাগ নিশ্চুপ থাকব। কোনো সাহাবির ছিদ্রান্বেষণ করার অধিকার আমাদের নেই। এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর চিরন্তন বিশ্বাস।

কারণ, মহান আল্লাহ কুরআন কারিমে তাঁদের সবার ওপর চিরকালীন সন্তুষ্টির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। [সূরা বাইয়্যিনাহ : ৮]

রাসূলুল্লাহ সা. একাধিক হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চার ব্যাপারে তীব্র সতর্ক করেছেন। খলিফা উমর ইবনুল আযিয রহ. তাঁর জীবনে শুধু এক ব্যক্তিকেই বেত্রাঘাত করে পিটিয়েছেন। লোকটির অপরাধ, সে হযরত মুআবিয়া রাদি.এর সমালোচনা করেছিল।

ইসলামের বুনিয়াদ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র থেকে যুগে যুগে ইসলামের ধূর্ত শত্রুরা সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রহনন করার অপচেষ্টা সবসময় চালিয়ে এসেছে। উসমান রাদি. এর যুগে আত্মপ্রকাশকারী সাবাঈ চক্র সর্বপ্রথম

সাহাবাবিদ্বেষের মিশন শুরু করে। তারা এক্ষেত্রে দু’জন সাহাবিকে টার্গেট করে। একজন খলিফাতুল মুসলিমিন উসমান রাদি.। দ্বিতীয় জন হযরত আমিরে মুআবিয়া রাদি.।

পরবর্তীকালে সমর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বিপর্যস্ত পশ্চিমা পরাজিত গোষ্ঠী প্রতিশোধের কাপুরোষচিত ভাবনা থেকে ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষকদেরকে সাহাবাবিদ্বেষের মিশনে লেলিয়ে দেয়। প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাবাঈ ও শিয়া বর্ণনাগুলোকে উপজীব্য বানিয়ে তারা ভয়াবহ হামলা শুরু করে।

.

ওরিয়েন্টালিস্টদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে কিছু ইসলামি গবেষক এতোটাই পরাজিত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়ে যে, তাদের কাছে ওরিয়েন্টালিস্টদের উপস্থাপিত প্রতিটি তথ্য মনে হয় সাক্ষাৎ অহি। তারা বুঝে-না বুঝে সেই তথ্য নিজেরাও যেমন গিলতে শুরু করে, তেমনই সাধারণ মুসলিমদেরকেও গেলাতে শুরু করে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ উসতায আবুল আলা মওদুদি। দুঃখের বিষয় হলো, ভারতের নদওয়াতুল উলামার বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা সালমান নদভি সাহেবও এ পথের পথিক। এ দু’জনের বই-পত্রই তাদের সেই প্রাচ্যবাদ প্রভাবিত মানসিকতার দলিল।

.

ক্ষোভ, আতঙ্ক ও কষ্টের বিষয় হলো, আমাদের দেশের তৃতীয় বৃহত্তর শিক্ষাধারা আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তকেও সেই সাবাঈ ও ওরিয়েন্টালিস্ট চক্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমি আজ শুধু দাখেল জামাতের ইসলামের ইতিহাস বই থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

এ বইয়ে বিখ্যাত সাহাবি হযরত মুআবিয়া রাদি. ও হযরত আমর ইবনুল আস রাদি. এর চরিত্রহনন করা হয়েছে খুবই নির্মম শব্দে। এক জায়গায় উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদি. এর বিষোদগারও করা হয়েছে।

এ বইয়ে হযরত মুআবিয়া রাদি.কে 'স্বার্থন্বেষী' 'সম্পদলোভী' 'ক্ষমতালোভী' 'উচ্চাভিলাষী' 'স্বার্থপর' 'ঔদ্ধত' 'জঙ্গি মনোভাবাপন্ন' 'চক্রান্তকারী' 'পরিস্থিতি ঘোলাটেকারী' 'অপরাজনীতিবিদ' 'ভোজবাজ' ও 'নিকৃষ্টতম শঠ' বলা হয়েছে। ঠিক এই বিশেষণগুলোই তাঁর সম্পর্কে এ বইয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। দেখুন, বইয়ের 149, 151, 152, 153 ও 154 পৃষ্ঠা। শুধু তাই নয়, যেখানে অন্য সাহাবির নামের পর 'রাদি.' দুআ এসেছে, সেখানে সতর্কতার সঙ্গে মুআবিয়া রাদি. এর নামের পর 'রাদি.' ব্যবহার করা হয়নি।

এর পাশাপাশি আলোচিত পৃষ্ঠাগুলোর নানা স্থানে হযরত আমর ইবনুল আস রাদি.কে 'ছলচাতুরিকারী' 'চক্রান্তকারী' 'ধূর্ত' 'হঠকারী' 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'কপট' বলা হয়েছে। যখনই তাঁর নাম এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণ হিসেবে 'ধূর্ত' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, নির্মমভাবে। তাঁর নামের সঙ্গেও 'রাদি.' দুআ বর্জন করা হয়েছে।

এমনকি এ বইয়ে জঙ্গে জামালের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা রাদি. হযরত আলি রাদি. এর প্রতি পূর্বশত্রুতা ও পূর্ববিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে এই যুদ্ধ বাধিয়েছেন। দেখুন, পৃষ্ঠা নম্বর 149।

আমি সবগুলো পৃষ্ঠা, লাইনে দাগ সহকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সাথে সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)এর ওয়েবসাইট থেকে বইয়ের পিডিএফ লিংক কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি।

.

আমি আশা করছি, উলামায়ে কেরাম বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিষয়টির ভয়াবহতা তুলে ধরবেন।

আমি সময়ের অভাবে পুরো বই পড়ার সুযোগ পাইনি। আলিয়ার সিলেবাসের অন্যান্য বইগুলো পড়ার সুযোগও হয়ে ওঠেনি। একটি বইয়ের পাঁচ-ছয়টি পাতায় যদি এমন বিষাক্ত আলোচনা থেকে থাকে তাহলে পুরো সিলেবাসের যত্রতত্র আরো ভয়াবহ ঈমানবিধ্বংসী আলোচনা থাকা অসম্ভব নয়।

আমি মনে করি, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারী হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিবাদ-প্রতিকার করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টির অসঙ্গতি তুলে ধরে অনতিবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করা আমাদের সবার ঈমানি দায়িত্ব।

✍️ আবদুল্লাহ আল ফারুক হাফি.

ইসলামের ইতিহাস

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

উমাইয়াদের স্বার্থহানী ঃ

হযরত আলী (রা.) উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত সরকারি ভূ-সম্পত্তি সরকারের নিকট প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেন। এর ফলে সিরিয়ার গভর্ণর আমীরে মুয়াবিয়া ও অন্যান্য স্বার্থন্বেষী উমাইয়াদের স্বার্থহানী ঘটে। সুতরাং তারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ শুধু করে।

হযরত আলী (রা.) এর সময়ে সংঘটিত গৃহযুদ্ধসমূহ ঃ

খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যা ইসলামের ইতিহাসে একটি সুপরিকল্পিত ঘটনার একটি মর্মান্তিক পরিণতি। তাঁর খিলাফতকালে রাজনৈতিক কোন্দল, ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাত, গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তা কেবল খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় পরিসমাপ্তি ঘটেনি, এর জের খলিফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে চলতে থাকে এবং পর পর তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে ইসলামের ঐক্য, সংহতি, নিরাপত্তা ও গৌরবের ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়। এগুলো ছিল (ক) উষ্ট্রের যুদ্ধ, (খ) সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ, (গ) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ ঃ

ইসলামের ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক ঘটনা হল উষ্ট্রের যুদ্ধ। মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত উষ্ট্রের যুদ্ধেই প্রথমবার হল। আত্মঘাতী যুদ্ধের এটাই শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র। এরূপ রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্ধের ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ ঃ

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি ঃ হযরত আলী (রা.) কে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেও হযরত তালহা ও হযরত জুবাইরের দাবি ছিল যে, খলিফা তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করবেন। খলিফা এ ব্যাপারে তাদের আশ্বস্তও করেছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) এর হত্যা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ ছিল না। এর সাথে কুফা, বসরা ও মিসরের অনেক লোক জড়িত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে সনাক্ত করা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিথিতি এমনিতেই ছিল জটিল ও সংকটময়। এমতাবস্থায় খলিফা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন নি। এতে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.) অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধচারণ শুরু করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর অসুন্তষ্টি ঃ মহানবি (স.) এর শত্রুগণ ও মুনাফিক প্রকৃতির দুই-একজন মুসলমান যখন হযরত আয়েশা (রা.) এর পূত চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছিল, তখন রাসুলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) এর পরামর্শ চাইলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এর দাসীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আল্লাহর রাসুলকে পরামর্শ দেন। অবশেষে ওহী নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তখন থেকে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.) এর প্রতি অসুন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি হযরত তালহা ও হযরত যুবাইরের দলে যোগ দেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা

উপর্যুক্ত কারণে হযরত তালহা (রা.), হযরত জুবাইর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ বিস্মৃত হয়ে একটি জোট গঠন করেন। শিগরিরই তাঁরা মক্কা, মদিনা ও ইরাক হতে তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করে বসরা আক্রমণ করেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের অন্যতম ফলাফল ছিল এই যে, এর ফলে মক্কা, বসরা ও কুফার মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান হয় এবং এতদঞ্চলে হযরত আলী (রা.) এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহ সমূলে উৎপাদিত করার জন্য প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কায়েস ইবন-সা'দ, সাহল ইবন-হানিফ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন-আব্বাসকে মিসর, হেজাজ ও বসরায় শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করলেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর খলিফা হযরত আলী (রা.) এর অন্যতম প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল মদিনা হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর। ইরাকিদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে এবং বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে খলিফা ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে কুফাকে রাজধানীর মর্যাদা দান করলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে মদিনার গুরুত্ব হ্রাস পেল। ফলে মদিনার জীবিত সাহাবিদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগল। তাঁরা খিলাফতে সক্রিয় অংশগ্রহণ হতে দূরে সরে গেলেন। অপরদিকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে হযরত আলী (রা.) এর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ অস্থিরমতিত্ব, প্রতারক, ষড়যন্ত্রকারী কুফাবাসীদের উপর তিনি অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়লে খোলাফায়ে রাশেদীনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খলিফা হযরত আলী (রা.) ও সিরিয়ার আমির মুয়াবিয়ার মধ্যকার সংঘর্ষ

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর মক্কা, মদিনা, ইরাক ও মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত এবং সুষ্ঠু হল বটে; কিন্তু এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে খলিফা হযরত আলী (রা.) এর সাথে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব ও তিক্ততা চলছিল। কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করে এবং প্রশাসনিক রদবদল দ্বারা খলিফা আলী (রা.) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে নির্দেশ দেন। একটি পত্রে খলিফা আলী (রা.) সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে ইসলামের স্বার্থে তাঁর আনুগত্য স্বীকারের আহবান জানান। কিন্তু চক্রান্তকারী ও উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া খলিফার আদেশ অমান্য করেন। উপরন্তু তিনি নিহত খলিফা উসমানের রক্তে রঞ্জিত পোষাক ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের বিচার না হলে তিনি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করবেন না। এভাবে প্রতিষ্ঠিত খলিফার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় ৬০,০০০ সিরীয় সৈন্য গঠন করে হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের কারণ ঃ

খলিফার বশ্যতা স্বীকার এবং শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে মুয়াবিয়ার অসম্মতি ঃ মাসুদী, পি, কে হিট্টি, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত সকল দুর্নীতিপরায়ণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অপসারিত করে তাদের স্থলে নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি মনে করলেন যে, এ নীতি অবলম্বন করলে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষিত হবে। হযরত মুঘিরা (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে এরূপ দুঃসাহসিক নীতি গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা হযরত আলী (রা.) তাঁদের কথার কর্ণপাত করেননি। ফলে সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শান্তির পরিবর্তে সমস্যা আরও জটিল হলো। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ব্যতীত সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ খলিফার আদেশ পালন করেন।

বায়তুলমালের প্রত্যার্পন ঃ

খলিফা হযরত উসমান (রা.) উমাইয়াগণকে যে সমস্ত জায়গির এবং সরকারি ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন হযরত আলী (রা.) তৎসমুদয় সরকারকে প্রর্ত্যপণ করার নির্দেশ দিলেন। এতে মুয়াবিয়ার স্বার্থহানি ঘটে। কারণ খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর

রাজত্বে মুয়াবিয়া এ সমস্ত উৎস হতে অজস্র ধন-সম্পদ লাভ করে প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত আর্থিক সুবিধা নষ্ট হওয়ায় উমাইয়াগণ হযরত আলী (রা.) এর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

উমাইয়া ও হাশেমী গোত্রের দ্বন্দ্ব ঃ

কুরাইশ বংশের হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে কলহ ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল তা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার তিক্ত সম্পর্কে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। মুয়াবিয়া কেবল উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন না, তিনি হযরত উসমান (রা.) এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতে তিনি অশেষ ধন-সম্পত্তি ও প্রভুত ক্ষমতা অর্জন করে রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। কিন্তু খলিফা পরিবর্তনের ফলে তিনি কোনোভাবেই তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই খিলাফতে পুনরায় উমাইয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উমাইয়াগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে খলিফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে।

মুয়াবিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সমর প্রস্তুতি ঃ

মুয়াবিয়া ছিলেন অত্যন্ত ক্ষশতালোভী ও উচ্চাভিলাসী। তিনি হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকে অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মুয়াবিয়া হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে হত্যাকারীদের তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করে শাস্তি প্রদান করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া খেলাফতের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করলে খিলাফতের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে মনে করে হযরত আলী (রা.) আপাতত শাস্তি প্রদানে অসমর্থ হলে, মুয়াবিয়া এর বিরূপ ব্যাখ্যা দান করে খলিফার বিরুদ্ধে এই মর্মে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, এ হত্যাকাণ্ডে খলিফা আলী (রা.) পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। এই জন্য তিনি শাস্তি প্রদানে কালক্ষেপণ করেছেন। হযরত উসমান (রা.) এর রক্তাক্ত বস্ত্রাদি এবং তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুলী প্রদর্শন করে সিরিয়াবাসীদেরকে হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেন। এরূপে উভয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ ঃ

সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার অবাধ্যতা সর্বোপরি যুদ্ধ তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.) ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে মুয়াবিয়াও খলিফাকে বাধা দেওয়ার জন্য ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামক প্রান্তরে উপস্থিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও মুসলমানদের অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়াকে বশ্যতা স্বীকার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় আহবান জানান। কিন্তু মুয়াবিয়ার ঔদ্ধত্য ও জঙ্গি মনোভাবের পরিবর্তন না হওয়ায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতি ক্ষেত্রে উত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও খলিফা হযরত আলী (রা.) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন।

অবশেষে ৬৫৭ খ্রি. ২৬ জুলাই সর্বপ্রথম মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী আক্রমণ রচনা করে। হযরত আলী (রা.) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে মুয়াবিয়াকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। মুয়াবিয়ার বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখে রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হলে সুচতুর সেনাপতি ও কূটনীতিবিদ আমর ইবন আল-আসের পরামর্শে মুয়াবিয়ার সৈন্যগণ বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কুরআন শরীফ বেধে যুদ্ধ বন্ধ করার এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করে।

খলিফা হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার এই রাজনৈতিক চালের তাৎপর্য বুঝতে পেরে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যদের মধ্যে যারা হাফিজ-ই-কুরআন ছিলেন, তাঁরা কুরআন শরীফের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, এটি শত্রুদের একটি রাজনৈতিক চালমাত্র। কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টা করেনি। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ বিরতিতে সায় দেন।

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা (জানুয়ারি, ৬৫৯ খ্রিঃ) ঃ

হযরত আলী (রা.) এর সাথে মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত করে বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ হতে কুফার পদচ্যুত গভর্নর সরল মনের হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) এবং মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে ধূর্ত আমর ইবন আল-আস প্রতিনিধি মনোনীত হল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উভয় সালিশ ৪০০ লোক সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবেন এবং কুরআনের নির্দেশানুসারে বিরোধ মীমাংসা করবেন। যদি তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারেন, তাহলে মীমাংসার দায়িত্ব আটশত লোকের উপর বর্তাবে এবং তাদের ভোটাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত হবে তা উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া পর্যায়ক্রমে কুফা ও দামেস্কে চলে যান।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আবু মুসা আল আশআরী ও আমর ইবন আল-আস প্রত্যেকে ৪০০ লোকসহ "দুমাতুল জন্দল" নামক স্থানে হাজির হলেন। মক্কা ও মদিনা থেকেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সালিসী মজলিশে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ্যে সালিসী মজলিশ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত আবু মুসা ও আমর এর মধ্যে গোপন আলোচনা হল। ধূর্ত আমর সরলমনা হযরত আবু মুসা আল-আশআরীকে বুঝালেন যে, ইসলামের শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া উভয়কেই অপসারিত করতে হবে এবং তৃতীয় একজনকে খলিফা নিযুক্ত করতে হবে। আরও স্থির হল যে, প্রথমে আবু মুসা হযরত আলী (রা.) এর পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন এবং পরে আমর ইন আল-আস মুয়াবিয়ার পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে হযরত আবু মুসা বললেন, হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া খলিফা পদে অনুপযুক্ত বিধায় উভয়কে অপসারণ করা হল। এখন আপনারা নতুন একজনকে মনোনীত করবেন। তিনি আরও বললেন, "আমি আলী (রা.)-এর পদচ্যুতির ঘোষণা দিলাম।" তারপর আমর ইবন আল-আস দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! আপনারা আবু মুসার রায় শুনলেন, তিনি তাঁর লোককে পদচ্যুত করেছেন। আমি তা গ্রহণ করলাম এবং মুয়াবিয়াকে সে পদে নিযুক্ত করলাম। এ রায়ে হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন, ক্রুদ্ধ মনে তারা কুফায় প্রত্যাবর্তন করল। দুমাতুল জন্দলের সালিসীর রায় হযরত আলীর জন্য এক মর্মান্তিক ঘটনা। খলিফার সাথে একজন প্রাদেশিক শাসকের খিলাফত ভাগের প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেয়ার এখতিয়ার জনগণেরই। এতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই।

দুমাতুল জন্দলের রায়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ

পক্ষপাতহীন ও আবেগমুক্ত দৃষ্টিকোণ হতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সালিসীর প্রস্তাব, বৈঠক এবং রায় এসবগুলিই নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে খিলাফতে উপবিষ্ট খলিফার স্বার্থের পরিপন্থী। এটি ছিল সুপরিকল্পিত, রাজনৈতিক ভোজবাজি ও নিকৃষ্টতম শঠতা। এটি কীভাবে হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং মুয়াবিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তা নিম্নের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হবে।

(ক) হযরত আবু মুসা (রা.) বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও আমরের তুলনায় ছিলেন সৎ, সরল, অকপট, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন অপরদিকে আমর ছিলেন ধূর্ত, হঠকারী, বিশ্বাঘাতক ও কপট। এর ফলে হযরত আবু মুসা আমরের চক্রান্তের শিকার হন। কারণ আমরই তাঁর নিকট উভয়কে পদচ্যুত করার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠতার দোহাই দিয়ে আমর হযরত আবু মুসাকে প্রথমে রায় ঘোষণা করতে বলেন।

(খ) হযরত আবু মুসা (রা.) খলিফাকে পদচ্যুত করলে হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদাহানি হয়। কিন্তু এতে মুয়াবিয়ার শক্তি হ্রাস হয়নি। কারণ, মুয়াবিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকায় তাঁকে খিলাফত হতে অপসারিত করার কোন প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু; তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করা হবে, এরূপ কোন প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, "উভয় মধ্যস্থ ব্যক্তি তাঁদের প্রভুদের পদচ্যুত করলে আলী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। মুয়াবিয়ার পদচ্যুতির জন্য কোন খিলাফত ছিল না। বস্তুত সালিসী তাঁকে আলীর সমকক্ষ করে তোলে এবং হযরত আলীকে একজন মিথ্যা দাবিদারের পর্যায়ের নামিয়ে ফেলে।" সুতরাং নির্বাচিত খলিফার সাথে একজন অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার খিলাফত ভাগের প্রশ্ন শুধু অবাস্তবই নহে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈধ।

(গ) আমর ও হযরত আবু মুসা (রা.) উভয়ের সালিশ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা তাদের প্রভুদের পদচ্যুত করবেন এবং পরবর্তী খলিফা মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সুতরাং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুনরায় প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু আমরের ছলচাতুরির ফলে মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন ছাড়াই খিলাফতে মুয়াবিয়ার কাল্পনিক দাবি প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ নীতি বহির্ভূত এবং আইনত অগ্রহণযোগ্য।

(ঘ) সালিসীর মূল বিষয় ছিল মুয়াবিয়া কর্তৃক উত্থাপিত হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার শাস্তি দাবি এবং হযরত আলী (রা.) কর্তৃক মুয়াবিয়ার অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমরের চক্রান্তে রায় প্রদানের ব্যাপারে এ দুটি মূল বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এবং তদস্থলে হযরত আলীর মনোনয়নের প্রকাশ্য সমালোচনা প্রাধান্য পায়।

(ঙ) কুরআনের পাতায় শরবিদ্ধ করে যুদ্ধ স্থগিত করা হয় সত্য; কিন্তু দুমাতুল জন্দলে আল্লাহর কুরআনকে শপথ ও অনুসরণ করে বিরোধি মীমাংসা করা হয়নি। এ কারণে খলিফা আলী (রা.) বিদ্রোহী শাসনকর্তার শঠতা ও কপটতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি। তিনি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলিফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নৃশংস হত্যার পর মুয়াবিয়া নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতালোভী না হলে মুয়াবিয়া ৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসর দখল করে চুক্তি মোতাবেক খলিফা আলীর জীবদ্দশায় আমর ইবন আল-আসকে মিসরের শাসকর্তা নিযুক্ত করতেন না।

খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অধ্যাপক পি. কে হিট্টির মতে খারেজিরা হলেন ইসলামের প্রাচীনতম ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় আরবি "খারাজ"। এই ক্রিয়াটি হতে খারেজি এই বিশেষ্য পদটি উদ্ভুত। "খারেজি" শব্দের অর্থ দলত্যাগী। দুমাতুল জন্দলের প্রতারণাপূর্ণ রায়কে অমান্য করে হযরত আলী (রা.) এর সমর্থক ১২ হাজার সৈন্য দলত্যাগ করে হারুরা নামক গ্রামে যেয়ে মিলিত হয়েছিল। তারা মানুষের বিচার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এ আওয়াজ তুলে যে, "লা হুকুমাহ ইল্লা লিল্লাহ" (অর্থাৎ আল্লাহর আইন ছাড়া কোনো আইন নেই। তাই সিফফীনের যুদ্ধের পর দুমাতুল জন্দলের সালিসের রায়কে অমান্য করে যে দলটি হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে তাদেরকে ইতিহাসে খারেজি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তারা দল ত্যাগ করে হারুরা নামক গ্রামে মিলিত হয়েছিল বলে হারুরীয়া এবং আল্লাহর হুকুমের প্রবক্তা ছিলেন বলে "মুহাককিমা" নামেও পরিচিত।

হযরত আলী (রা.) এর ব্যর্থতার কারণ

রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ঃ

হযরত আলী (রা.) যোদ্ধা ও বিদ্বান হিসেবে মুয়াবিয়া অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ হলেও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি মুয়াবিয়ার ন্যায় প্রভাবশালী শাসনকর্তাকে অপসারণ করে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার মত বিচক্ষণ ও শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে সৌহার্দ্য রক্ষা করে চললে হযরত আলী (রা.) তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দুর্যোগ এড়াতে ও খিলাফতের শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হতেন। কিন্তু তিনি সিফফীনের যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করে এবং পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়ার সাথে অহেতুক আপোষ মীমাংসা করে নিজের পতনকে ত্বরান্বিত করেন।

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানে দীর্ঘ সূত্রীতা ঃ

হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আয়েশা (রা.) ও মুয়াবিয়া হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। খিলাফতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় হযরত আলী (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে মারাত্মক ভুল করেন এবং পরিণামে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন।

হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুবিধা ঃ

উষ্ট্রের যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার অপরাধীরাই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থার চাপে পড়ে অথবা ঘটনাচক্রে হযরত আলী (রা.)-কে তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্য কথায় তারা হযরত আলী (রা.)-এর প্রধান সমর্থক হয়। এতে মুয়াবিয়া হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয়দানের অভিযোগ আনার সুযোগ পান। এ অপপ্রচার সাধারণ মানুষের মনে খলিফার প্রতি বিষিয়ে তুলে এবং তারা খলিফার আন্তরিকতায় সন্দিহান হয়ে ওঠে। এটিও হযরত আলী (রা.)-এর ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

হযরত তালহা ও হযরত জুবাইয়ের মৃত্যুতে হযরত আলী (রা.)-এর ক্ষতি

খিলাফতের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সময় খলিফা হযরত আলী (রা.) পাননি। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত প্রাপ্তির চতুর্থ মাসে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত তালহা, হযরত জুবাইর ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধে জয়লাভের ফল হযরত আলী (রা.)-এর কোনো লাভ হল না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুস্কৃতিকারীগণ কর্তৃক হযরত তালহা ও হযরত জুবাইরের হত্যার ফলে হযরত আলী (রা.) এর শক্তি হ্রাস পায়। অপরদিকে হযরত আলী (রা.) উষ্ট্রের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে মুয়াবিয়া যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। অধিকন্তু; হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে হযরত আলী (রা.) প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় মহানবি (স.)-এর ধর্মভীরু অনুসারীদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে হযরত আলী (রা.) ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিও মুয়াবিয়ার জন্য বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) এর অদূরদর্শীতা ঃ

হযরত আলী (রা.) দুমার মীমাংসায় তাঁর পক্ষে বয়োবৃদ্ধ ও সরলমনা হযরত আবু মুসা আল-আশআরীকে সালিস নিয়োগ করে মারাত্মক ভুল করেন। কারণ আবু মুসা (রা.) মুয়াবিয়ার ধূর্ত সালিস আমর ইবন আল-আসের সূক্ষ্ম দাবার চালের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। কাজেই চরম সমস্যাপূর্ণ ব্যাপারে এহেন সরলমনা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা হযরত আলী (রা.) এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।